মুসলিম জনগোষ্ঠী এবং "ধর্মনিরপেক্ষ" রাজনৈতিক দল

আসিম আলী

৭ নভেম্বর, ২০২২

২০১৮ সালে, কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী একটি সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে তিনি ২০১৪-র নির্বাচনে তাঁর দলের শোচনীয় পরাজয়ের কারণ বর্ণনা করেন। অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে তিনি যেটির উপর জোর দেন সেটি হল, ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) "জনগণকে বিশ্বাস করাতে পেরেছে যে কংগ্রেস পার্টি একটি মুসলিম দল"। এই বক্তব্যটি থেকে বোঝা যায় যে, এ.কে. অ্যান্টনি তাঁর বিবৃতিতে যে রোগটি নির্ণয় করেছিলেন, কংগ্রেস দল তার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। এ.কে. অ্যান্টনির বিবৃতিটিই প্রথম চিহ্নিত করে যে, ভোটদাতা ধরেই নিয়েছিলেন কংগ্রেস দল সংখ্যালঘু তোষণের অবস্থান নিয়েছে এবং এই ধারণাই নির্বাচনে কংগ্রেসের পতনের কারণ।

অবশ্যই কংগ্রেসই একমাত্র দল নয় যারা এই "মুসলিমদের প্রতি পক্ষপাত" – এই অবস্থানটি সংশোধন করার আপাত প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে লড়াই করছিল। বর্তমান রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে তাদের রাজনৈতিক মঞ্চে মুসলিম বা "মুসলিমত্বের" কোনরকম দৃশ্যমান উপস্থিতি একটি বিপজ্জনক পণ্যে পরিণত হয়েছে – এই ধারণাটিকে অন্যান্য অনেক ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলই, বিশেষ করে উত্তর ভারতের দলগুলি, আত্মস্থ করে নিয়েছে।

যাই হোক না কেন, ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি এখনও মুসলিমদের এমন একটি সমরূপ গোষ্ঠী বলে কল্পনা করে যাদের একটি স্পষ্ট রাজনৈতিক স্বার্থ আছে এবং এই মুসলিম "ভোট-ব্যাঙ্কের" উপর তাদের দাবি পরিত্যাগ করতে তারা একেবারেই প্রস্তুত নয়। তবে, বিজেপির কাজের জোরালো প্রক্রিয়াটি এই দলগুলির সঙ্গে তাদের মুসলিম ভোটোদাতাদের সম্পর্কের ধাঁচাকে দুর্বল করে দিয়েছে।

যুক্তিপটের বদলঃ মুসলিম প্রশ্নের রাজনীতি

মুসলিমদের নিজস্ব সমস্যার চিরাচরিত সংকলনটিকে কেন্দ্র করে মুসলিমদের সংহত ও পরিচালিত করার অবস্থান থেকে ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি সরে গেছে। হিলাল আহমেদ তাঁর *সিয়াসি মুসলিম* বইটিতে যেমন উল্লেখ করেছেন, মুসলিম ভোট-ব্যাঙ্কের কল্পনাটি চিরকালই মুসলিমদের সমস্যাগুলির একটি নির্দিষ্ট বিন্যাসের উপর নির্ভরশীল। এই সমস্যাগুলির মধ্যে আছে বাবরি মসজিদ, ব্যক্তিগত আইন, উর্দু এবং জামিয়া ও এএমইউ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যালঘু চরিত্র। ধর্মনিরপেক্ষ দল এবং অভিজাত মুসলিমরাই এই সমস্যাগুলিকে মুসলিম গোষ্ঠীর ভোট পাওয়ার প্রাথমিক উপায় হিসেবে গড়ে তুলেছেন।

এই সমস্ত সমস্যার সবকটির মধ্যেই একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। এগুলি কার্যত "নেতিবাচক সমস্যা" যার ফলাফল মুসলিমদের কয়েকটি বিদ্যমান "বিশেষাধিকারের" সুরক্ষা। যদিও এই সমস্ত সমস্যা (ব্যক্তিগত আইন, বাবরি, এএমইউ ইত্যাদি) এখনও সংখ্যাগুরু হিন্দু গোষ্ঠীর আলোচনার অংশ, ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলি এই সমস্যা নিয়ে স্পষ্টভাবে কোনও মতামত দিতে বিরত থাকে। "মুসলিম প্রশ্ন" থেকে এই আলোচনাকেন্দ্রিক দূরত্বের মূলে আছে "হিন্দু সংহতি" নিয়ে তৈরি হওয়া এক ধরনের ভীতি। তিন তালাক আইনের পাশাপাশি

রাম মন্দির সংক্রান্ত রায় – দুটি বিষয়ই, হয় উদাসীনতার সঙ্গে, নয়ত মূকভাবে গৃহীত হয়। সুতরাং, মুসলিমদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু বিশেষ নীতিকে (ব্যক্তিগত আইন, উর্দু, এএমইউ ইত্যাদি) সুরক্ষিত রাখছে বলে দাবি করার বদলে, ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি এখন মুসলিমদেরকেই নিরাপত্তা দেওয়ার কথা বলে থাকে।

বিজেপি যে অনির্দিষ্ট ভীতির বাতাবরণটি তৈরি করেছে, মুসলিম গোষ্ঠীকে একযোগে তার বিরুদ্ধে ভোট দিতে অনুরোধ জানান হয়। যে রাজ্যগুলিতে বিজেপি ছাড়াও আরও অনেক বিকল্প রাজনীতিক দল আছে, তারা নিজেদের বিজেপির প্রধান বিরোধী বলে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে। "বি দল" বলে যে কথাটি আজকাল খুবই শোনা যাচ্ছে, তার মধ্যেই এই ঘটনাটি প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। প্রধান বিরোধী দলের ভাগের মুসলিম ভোটের খানিকটা কেড়ে নিচ্ছে বলে যে দল অভিযুক্ত হয়, তারা "বিজেপির বি দল" বাক্যবন্ধটি ব্যবহার করে থাকে। সম্প্রতি অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিনের (এআইএমআইএম) পাশাপাশি বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসএস) ও জনতা দল (সেক্যুলার) (জেডি[এস]) মত অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলিকে "বি দল" অভিধা নিয়ে খুশি থাকতে হয়েছে। তাই, "মুসলিম ভোট-ব্যাঙ্কের" সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য হল বিজেপিকে পরাজিত করা - এই ভাবেই দেখা হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়ত, ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি মুসলিমদের ক্ষমতায়ন নিয়ে আলোচনার পরিসরটিকে মুসলিম পরিচয়-কেন্দ্রিক দলগুলির হাতে তুলে দিয়েছে। সাচার কমিটি পর্যায়ের পরবর্তী সময়ে, ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি আবার সংখ্যালঘুদের ক্ষমতায়নে, বিশেষ করে সংখ্যালঘু সংরক্ষণের প্রশ্নটি নিয়ে, আগ্রহ দেখাতে শুরু করে। যেমন, ২০১২ সালে উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনে কংগ্রেস এবং সমাজবাদী দল – উভয়েই চাকরীর ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু সংরক্ষণের পক্ষে দাবি তুলেছে। মুসলিমদের "অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার" ট্রোপটিকে ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স (ইউপিএ) সরকারের অধীনে পরিচালিত গবেষণাগুলি জনপ্রিয় করেছে ও, তার পাশাপাশি, বৈধতাও দিয়েছে। বামপন্থী দলগুলিকে আক্রমণ করার সময় পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেসও (টিএমসি) একই পন্থা নিয়েছিল। এর এক দশক পরে, একমাত্র এআইএমআইএম দলটি উত্তর প্রদেশের নির্বাচনে মুসলিম "অনগ্রসরতার" আখ্যানটিকে ব্যবহার করেছে। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের মমতা ব্যানার্জিও "নিরাপত্তার রাজনীতির" উপর জোর দিচ্ছিলেন। মুসলিম ভোটদাতাদের হুঁশিয়ার করার জন্য তিনি বলছেন, ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্টের (আইএসএফ) আব্বাস সিদ্দিকী "মুসলিম ভোট বিভাজনের জন্য বিজেপির কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন . . . বিজেপি ক্ষমতায় এলে আপনারা সুবিশাল বিপদের মুখোমুখি হতে চলেছেন"। এদিকে, মুসলিমদের সঙ্গে টিএমসির সম্পর্কটি আসলে বিশ্বাসঘাতকতার – এই আখ্যানটি নির্মাণের জন্য আইএসএফ নিজেই আবার (তাদের নিজস্ব ধর্মীয় অলঙ্কারপূর্ণ উক্তিগুলির সঙ্গে সঙ্গে) এই "অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার" ভাষা ব্যবহার করছে।

ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির ক্ষেত্রে, ভোটদাতাদের মধ্যে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতার ধারণার ব্যাপক বিস্তার হওয়ায়, এই দলগুলি মুসলিম পরিচয়ের চিরাচরিত প্রশ্নটির পাশাপাশি, মুসলিমদের ক্ষমতায়নের তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক প্রশ্নটিকে স্পষ্টভাবে অনুধাবনের জন্য খুবই স্বল্প পরিসর পাচ্ছে। কংগ্রেসের জোটকে নিরাপত্তার রাজনীতির ধারণাটি সাহায্য করলেও, উত্তরপ্রদেশের সমাজবাদী পার্টি (এসপি), পশ্চিমবঙ্গের টিএমসি, বিহারের রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-র মত বিজেপির প্রাথমিক বিরোধী দলগুলিকে যদি নিজের নিজের রাজ্যে তিন-চতুর্থাংশের বেশি মুসলিম ভোট পেতে হয় তবে এই কৌশলটি দীর্ঘস্থায়ীভাবে আদৌ কাজে আসবে কিনা তা পরিষ্কার নয়। প্রকৃতপক্ষে, বিহারের সীমাঞ্চল প্রদেশে এআইএমআইএম দলের সুবিশাল সাফল্য বা নিম্ন আসাম ও বরাক উপত্যকায় অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের (এআইইউডিএফ) অব্যাহত ক্ষমতা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে, যে সমস্ত মুসলিমপ্রধান

অঞ্চলগুলিতে উচ্চাকাঙ্ক্ষার রাজনীতির গুরুত্ব নিরাপত্তার রাজনীতি থেকে অনেক বেশি, সেখানে ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি লড়াই অনেক কঠিন।

একটি ব্যবহারিক পরিবর্তনঃ প্রতিনিধিত্বের রাজনীতি

মুসলিম প্রশ্নের ক্ষেত্রে এই যুক্তি ও আলোচনাকেন্দ্রিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি মুসলিম প্রতিনিধিত্বের বিষয়ে তাদের ধারনার সংস্কার করেছে। যেহেতু, নির্বাচনের সময় মুসলিমদের সংহত করার ক্ষেত্রে "মুসলিম সমস্যা" আর প্রাথমিক চালিকাশক্তি নয় এবং তারই অনুষঙ্গে, মুসলিম সমস্যার নির্মাণ ও উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সেগুলি ব্যবহারের ক্ষেত্রে মুসলিম ধর্মীয় ও রাজনৈতিক গুরুদের কার্যকারিতায় একটি পতন ঘটেছে। ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি এখন এই রকম মুসলিম মধ্যস্থতাকারীদের উপর কম নির্ভরশীল। তার বদলে, এই দলগুলি এখন তাদের মুসলিম ভোটদাতাদের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করছে।

অসংখ্য সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে, নির্বাচনী ক্ষেত্রে মুসলিম ধর্মগুরুদের প্রাসঙ্গিকতা অনেক দিন ধরেই কমছে। ছাত্রছাত্রী, অ্যাক্টিভিস্ট এবং বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে গঠিত একটি মধ্যবর্তী গোষ্ঠীর নেতৃত্বে ধর্মনিরপেক্ষ ভাষায় পরিচালিত নাগরিকত্ব আইন বা সিএএ-বিরোধী আন্দোলনটির ফলশ্রুতিতে মুসলিম ধর্মাবলম্বী জনগণের মধ্যে উলেমাদের যেটুকু রাজনৈতিক প্রভাব বাকি ছিল সেটুকুরও চলে যায়। নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও ধর্মগুরুদের মধ্যে যেমন সখ্যতা দেখা যেত, উত্তরপ্রদেশের সাম্প্রতিক নির্বাচনে সেই চিরপ্রচলিত ঘটনাটি খুব কমই ঘটতে দেখা গেছে। কার্যত, ইত্তিহাদ-ই-মিল্লাতের মৌলানা তাকীর রাজার উপর অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়ার মধ্যে দিয়ে, একমাত্র উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেসই এই প্রথাটির চর্চার চেষ্টা করেছে। তাদের এই প্রচেষ্টা, বৃহত্তর জনতার মতই, মুসলিম ভোটদাতারাও ব্যাপকভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। একইভাবে, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস-বামপন্থী জোট, আব্বাস সিদ্দিকীর মত একজন উগ্র ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সংঘবদ্ধ হলে তা খুবই স্বল্প সংখ্যক মুসলিম ভোট আকর্ষণ করে। উল্লেখযোগ্য যে, ধর্মীয় নেতাদের পশ্চাদ্ধাবন করার এই কৌশলটিকে আগে যেমন অত্যন্ত স্বাভাবিক বলেই ভাবা হত, তা এখন মুসলিমদের প্রভাবিত করার শেষ উপায় হিসেবে রাজনৈতিক বিবাদে ব্যবহৃত হচ্ছে, এবং যে সমস্ত দল এই পন্থাটি অনুসরণ করছে তারা তৃতীয় বা চতুর্থ স্থানে পড়ে আছে।

ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলিতেও মুসলিম পরিচয়ের উপর জোর দেওয়ার বিষয়টিতে অনুরূপ পতন ঘটতে দেখা গেছে। এ কথা সত্যি যে, ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলিতে মুসলিম এমপি ও এমএলএরা ঐতিহাসিকভাবে দলের সাধারণ কর্মপদ্ধতিকেই গ্রহণ করেছেন, এবং তাঁদের স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বরের অধিকার দেওয়া হয় নি। কিন্তু এই পার্টিগুলির বিশিষ্ট মুসলিম সদস্যদের পার্টির মুখ হিসেবে গড়ে তোলার ঝোঁক দেখা যায়। এই মুখগুলি রাজ্য এবং দেশের স্মৃতিতে রয়ে যেতে সক্ষম এবং "মুসলিম প্রশ্নে" দলের অবস্থানকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন (এসপির আজাম খান, আরজেডির মহম্মদ আশরাফ ফাতমি এবং কংগ্রেসের সলমন খুরশিদ)। এই ধরনের টোকেনিজমের প্রয়োজনীয়তা এখন কমেছে। এসপি ও আরজেডি কোনও মুসলিম মুখ ছাড়াই প্রচারের কাজ চালিয়েছে এবং তা সত্ত্বেও তারা সুবিশাল সংখ্যায় মুসলিম ভোট পেয়েছে। আদতে, এসপি নির্বাচনের আগের দুই বছর কাটিয়েছে আইনি সমস্যায় বিজড়িত আজাম খানের থেকে ধীরে ধীরে দূরত্ব তৈরি করার প্রচেষ্টায়। ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির মুসলিম প্রতিনিধিরা মূলত তাঁদের দলের কর্মপদ্ধতিই অনুসরণ করেন এবং যে প্রশ্নগুলি থেকে কোনও রকম মেরুকরণের সম্ভাবনা আছে, সেগুলির বিষয়ে নিশ্চুপ থাকাকেই তাঁদের কর্তব্য বলে মনে করেন। তার উপর, মুসলিমরা প্রতীকী প্রতিনিধিত্বকে বেশি গুরুত্ব দেন না বলেই দেখা গেছে। উত্তরপ্রদেশে বিজেপি বিশাল সংখ্যক মুসলিম প্রার্থী দিলেও (৪০৩ জনের

মধ্যে একানব্বই জন) তাঁদের মধ্যে একজনও নির্বাচনে জয়লাভ করেন নি। ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি চেষ্টা করছে দৃশ্যমানভাবে মুসলিম মুখের উপস্থিতি দেখানর বদলে সরাসরি মুসলিম ভোটদাতাদের সঙ্গে সংযোগ তৈরির, যা আবার "মুসলিম তোষণ" বলে বিজেপি যে অভিযোগ করে, তার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মুসলিম ধারণাটির পুনঃসংজ্ঞায়ন, রাজনৈতিকভাবে

নিঃসন্দেহে, রাজ্য ধরে বিশ্লেষণ করলে ছবিটি আরও জটিল হয়ে দাঁড়ায়। মুসলিমদের বিষয়ে ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির অবস্থান নির্ভর করে রাজ্যের রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার কাঠামোর উপর, অর্থাৎ তারা বিজেপির সঙ্গে একটি দ্বিপাক্ষিক লড়াইয়ের অংশ না একটি ত্রিদলীয় যুদ্ধে জড়িত। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, তেলেঙ্গানার কংগ্রেসপ্রধান রেবন্থ রেড্ডি দৃঢ় ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে মুসলিমরা দলিতদের চেয়েও বেশি পিছিয়ে আছেন এবং মুসলিমদের জন্য প্রতিশ্রুত বার শতাংশ সংরক্ষণটিকে বাস্তবায়িত করার ব্যর্থতার বিষয়টি নিয়ে তিনি তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিথি (টিআরএস) সরকারকে কোণঠাসা করে ফেলেছেন। কর্ণাটকের কংগ্রেস নেতৃত্ব, বিশেষ করে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া বিদ্যালয়ে হিজাব পরার উপর নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে সুদৃঢ় অবস্থান নিয়েছেন। মুসলিমদের ক্ষমতায়ন ও মুসলিম পরিচয়কে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া কথোপকথনে রাজস্থান বা মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস শাখার পক্ষে এই রকম অবস্থান নেওয়া সম্ভব নয় কারণ, এই দুই রাজ্যেই তারা বিজেপির সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতায় জড়িয়ে আছে। একই ভাবে, এসপি, আরজেডি ও টিএমসির অবস্থানে বদল এসেছে তাদের নিজের নিজের রাজ্যের রাজনৈতিক প্রতিযোগিতায় ক্রমবর্ধমান দ্বিমেরুকরণের কারণে, যা আবার বিজেপির উত্থানের ফলশ্রুতি।

এছাড়াও, দলীয় মঞ্চের ভিতরে কিছু সৃজনশীল দ্বন্দ্বের পরিসর তৈরি হয়েছে। যেমন, "মুসলিম প্রশ্ন" থেকে কংগ্রেস দলের আলোচনাকেন্দ্রিক দূরত্ব তৈরি হওয়ার সময় থেকেই, পশ্চিমবঙ্গের আইএসএফ এবং আসামের এআইইউডিএফের মত মুসলিম পরিচয়কেন্দ্রিক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে একত্রে কাজ করার আগ্রহ তৈরি হতে দেখা গেছে। এই দ্ব্যর্থতার কারণে দলের ভিতরেই বিতর্ক শুরু হয়েছে। প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা কপিল সিবল এই জাতীয় সহযোগিতাকে সমালোচনা করেছেন ও জোর দিয়ে বলেছেন, "সংখ্যালঘু এবং সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িকতা, দুইই দেশের পক্ষে বিপজ্জনক"। তার উত্তরে, সলমন খুরশিদ দলের এই পদক্ষেপকে সমর্থন করে নেহরুর সাবধানবাণী উদ্ধৃতি করে জানিয়েন, "সংখ্যালঘুর সাম্প্রদায়িকতার থেকে সংখ্যাগুরুর সাম্প্রদায়িকতা অনেক বেশি বিপজ্জনক"।

বিজেপির জোরাল কার্যপ্রণালীর উত্থানের ফলে ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলিরা যেভাবে মুসলিমদের দেখে তার দুর্বলতাগুলি সামনে এসে গেছে। এই দেখার চোখ মুসলিম পরিচয়ের একটি সেকেলে ব্যাখ্যায় আজও আটকে রয়েছে এবং মুসলিম ভোট-ব্যাঙ্কের একটি শোষণমূলক ধারণার সঙ্গে বাঁধা। ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির রাজনৈতিক মঞ্চে মুসলিমদের দৃশ্যমানতা বা তাদের "মুসলিমত্বকে" চেপে দেওয়াই হল এই দলগুলির প্রতিক্রিয়া। তবে নির্বাচনের কারণে মুসলিমদের সংহত ও চালিত করার ক্ষেত্রে, তারা "নিরাপত্তার রাজনীতির" জোরালো ছাঁচটিতেই আটকে গেছে, যদিও এই সুরক্ষার শর্তগুলি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আশা করা যেতে পারে যে, বর্তমান পর্যায়টি একটি ক্রান্তিকালীন অবস্থাকে মূর্ত করে এবং ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি তাদের মুসলিমত্বের ধারণাকে অনতিবিলম্বে আরও সৃজনশীলভাবে পুনর্নির্মাণ করতে পারবে।

আসিম আলী একজন স্বাধীন রাজনীতি বিষয়ক গবেষক।